OPEN ACCESS
IF 8.111

*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 76*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 686 - 692*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

***Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)***
***A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture***
*Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 686 - 692*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in*
*(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848*

# মানবমুক্তির পথ হিসেবে সংস্কৃতিচর্চা : মোতাহের হোসেন চৌধুরীর ‘সংস্কৃতি কথা’ প্রবন্ধের আলোকে

মুহম্মদ অবেদুল্লাহ
প্রভাষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ (ইউল্যাব)
Email ID: md.abedullah@ulab.edu.bd

***Received Date*** *15. 06. 2026*
***Selection Date*** *15. 07. 2026*

***Keyword***
*Culture, Art and Literature, Human Development, Liberation, Humanity.*

***Abstract***
*According to Motaher Hossain Chowdhury (1903–1956) the practice of art, literature and culture serves as a pathway to inner awakening, moral refinement and individual liberation. He argues that literature and art cultivate human emotions and contribute to the development of humanity by enabling individuals to experience love, beauty and joy. The objective of this study is to analyze the concept of liberation through the practice of art and literature based on a close reading of Motaher Hossain Chowdhury's essay Sanskriti Katha. The central research question is: How can cultural practice contribute to human development? This study explores how art and literature foster humanity, empathy and an environment conducive to both personal and social liberation.*

## Discussion

১

উনিশ শতকের সূচনালগ্নে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাবে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে গভীর পরিবর্তন শুরু হয়। নতুন শিক্ষাব্যবস্থা, প্রশাসনিক কাঠামো, মুদ্রণপ্রযুক্তি, সংবাদপত্র ও আধুনিক জনপরিসরের বিকাশে একটি নতুন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থান ঘটে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে হিন্দু মধ্যবিত্তের একটি অংশ তুলনামূলক দ্রুত যুক্ত হতে পারলেও মুসলমান সমাজের একটি বড় অংশ শিক্ষা ও প্রশাসনের নতুন কাঠামো থেকে দূরে থাকে। ফলে উনিশ শতকের দীর্ঘ সময় জুড়ে মুসলমান সমাজের মধ্যে শিক্ষা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পশ্চাৎপদতার বোধ ক্রমশ তীব্র হয়। উনিশ শতকের শেষভাগে শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্তের বিকাশের ফলে পরিস্থিতির পরিবর্তন শুরু হয়। তারা অনুধাবন করতে পারে, সামাজিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতির জন্য কেবল আধুনিক শিক্ষা যথেষ্ট নয়; জ্ঞান, সাহিত্য, ভাষা, শিল্প, রুচি ও জীবনযাপনের ক্ষেত্রেও নিজেদের অবস্থান নির্মাণ করতে হবে। ফলে মুসলমান সমাজের সংস্কার ও জাগরণের জন্য ক্রমেই সংস্কৃতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হতে থাকে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 76
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 686 - 692
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

১৯২৬ সালে মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রতিষ্ঠা ছিল ঔপনিবেশিক বাংলায় বাঙালি মুসলমান সমাজের বুদ্ধিবৃত্তিক পশ্চাৎপদতা থেকে উত্তরণের একটি সচেতন প্রয়াস। এই সমাজের উদ্যোক্তারা উপলব্ধি করেছিলেন, ধর্মীয় আবেগের মাধ্যমে নয়; শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্য দিয়েই একটি জাতির চিন্তাশক্তি, রুচিবোধ ও আত্মসমালোচনার ক্ষমতা বিকশিত হয়। মুসলিম সাহিত্য সমাজের লক্ষ্য ছিল বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে একটি যুক্তিনির্ভর, মানবিক ও আধুনিক বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনা গড়ে তোলা। যা ধর্মীয় পরিচয়ের সংকীর্ণতা অতিক্রম করে বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পরিসরে আত্মপ্রকাশ করতে সহায়তা করবে। মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রথম অধিবেশনে বার্ষিক বিবরণী পাঠ করতে গিয়ে সম্পাদক আবুল হুসেন প্রথম বাক্যটি উচ্চারণ করেন, -

> “যে জাতির সাহিত্য নাই তাহার প্রাণ নাই - আবার যে জাতির প্রাণের অভাব সে জাতির ভিতর সত্যকার সাহিত্য জন্মলাভ করতে পারে না।”[১]

মুসলিম সাহিত্য সমাজ মনে করত, শিল্প ও সাহিত্য এমন এক ক্ষেত্র যেখানে সমাজ নিজের দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি হওয়ার মধ্য দিয়েই বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ সাধিত হয়।

> “কোন দেশকে সভ্য ও মানুষ করার বাসনা তোমার আছে? তাহলে বিধি-ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে, সেই দেশের সাহিত্যকে উন্নত করতে তুমি চেষ্টা কর।”[২]

> “মুসলিম সাহিত্য সমাজের সঙ্গে ‘সাহিত্য’ শব্দটি যুক্ত থাকলেও এটি প্রচলিত অর্থে সাহিত্য সংগঠন ছিল না, এটি মূলত ও প্রধানত ছিল একটি চিন্তাচর্চা কেন্দ্র বা প্রতিষ্ঠান।”[৩]

‘শিখা’ পত্রিকা এই দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রকাশভূমি। পত্রিকার প্রবন্ধসমূহে সাহিত্য, ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি - সবকিছুই আলোচিত হয়েছে প্রশ্নাত্মক ও বিশ্লেষণী ভঙ্গিতে। ফলে শিখার লেখকরা সচেতনভাবেই জনপ্রিয়তার পথ পরিহার করে একটি সীমিত কিন্তু মননশীল পাঠকগোষ্ঠীর উদ্দেশে লিখেছেন। এই অবস্থানই প্রমাণ করে, মুসলিম সাহিত্য সমাজের কাছে সাহিত্য ছিল সামাজিক দায়িত্ববোধের অনুশীলন। শিখা পত্রিকায় প্রকাশিত ‘বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য-সমস্যা’, ‘বাঙালি মুসলমানের শিক্ষা-সমস্যা’, ‘সংগীত চর্চায় মুসলমান’, ‘বাংলার লোক-সংগীত’ প্রভৃতি প্রবন্ধ পাঠ করে বোঝা যায়, মুসলিম সমাজের সাংস্কৃতিক পুনর্গঠনে কেবল সাহিত্য বা ধর্ম নয়; শিক্ষা, সংগীত, লোক-ঐতিহ্য, সামাজিক আচরণ ও চিন্তার স্বাধীনতাও গুরুত্বপূর্ণ। ফলে সংস্কৃতি ক্রমে সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের রক্ষাকবচ থেকে মানুষের সামগ্রিক মানসিক বিকাশের ধারণায় পরিণত হতে থাকে।

মোতাহের হোসেন চৌধুরী (১৯০৩-১৯৫৬) এই আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন এবং কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), আবুল হুসেন (১৮৯৬-১৯৩৮), কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১), আবুল ফজলের (১৯০৩-১৯৮৩) মতো মননশীল চিন্তকদের সঙ্গে যৌথভাবে এই বুদ্ধিবৃত্তিক পরিসর নির্মাণে ভূমিকা রেখেছেন। মোতাহের হোসেন চৌধুরীর লেখনী সুসংহত জীবনদর্শনের প্রকাশ। মুক্তবুদ্ধি, মননশীলতা ও মানবিক মূল্যবোধ তাঁর চিন্তার মৌলিক উপাদান। ইউরোপীয় রেনেসাঁ ও এনলাইটেনমেন্ট থেকে উৎসারিত উদারনৈতিক ও মানবতাবাদী আদর্শ তিনি গভীরভাবে আত্মস্থ করেছিলেন। তবে তা অনুকরণ না করে উপনিবেশ-উত্তর বাংলার সামাজিক বাস্তবতায় তিনি এই আদর্শকে নতুনভাবে রূপান্তরিত করেছিলেন। এই অর্থে তাঁর চিন্তা একদিকে বিশ্বজনীন, অন্যদিকে স্বদেশজ বাস্তবতায় প্রোথিত। তাঁর মৌলিক রচনাগুলো কোনো ধারার ছায়ামাত্র নয়; সেগুলোতে একটি স্বতন্ত্র কণ্ঠ ও দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

> “মোতাহের হোসেন চৌধুরীর ‘সংস্কৃতি কথা’ প্রবন্ধ-গ্রন্থটি তাঁর মৃত্যুর বেশ কিছুকাল পরেই প্রকাশিত হয়। গ্রন্থোক্ত রচনাগুলো ভাষা-আন্দোলনের পূর্ব থেকে তিনি নানা সাময়িকপত্রে লিখে আসছিলেন। বলতে গেলে তাঁর প্রবন্ধ-গ্রন্থটি দিয়েই বাংলাদেশে প্রবন্ধ-সাহিত্যের শুরু। তাঁর রুচি পরিশীলিত, মনোভাব উদার, দৃষ্টিভঙ্গী উদার এবং মানবিক, ভাষা সরস; যা ভেবেছেন ভাষায় বাঁধতে পেরেছেন, যা পড়েছেন বাঙালী মনে গৃহীত হয় মতো করে তার থেকে সারভাগ চয়ন করেছেন এতগুলো গুণ যে গ্রন্থের তা সমাদৃত হওয়ারই কথা নাই বা রইল কোনো মৌলিকতা।”[৪]

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 76
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 686 - 692
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এই স্বকীয়তাই তাঁকে বাঙালি মুসলমান বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যের দৃঢ় অবস্থানে স্থাপন করেছে। তাঁর প্রবন্ধসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনি বিচ্ছিন্ন বিষয়ের ওপর এলোমেলো আলোচনা করেননি; একটি সুসংহত চিন্তাধারার ভেতর দিয়ে কীভাবে মানবজীবনকে অধিকতর সুন্দর, পরিশীলিত ও অর্থবহ করে তোলা যায় এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন।

## ২

> "সাধারণভাবে বলতে গেলে যুগ-যুগের অনুভূতি আর অভিজ্ঞতার ফলে জীবন-যাপনের যে বিশিষ্ট ধারা গড়ে ওঠে, তারই নাম 'সংস্কৃতি'। এর প্রতিশব্দ হিসেবে বাংলা ভাষায় কৃষ্টি, কালচার, সভ্যতা, ঐতিহ্য প্রভৃতি শব্দের প্রচলন আছে।"[৫]

অক্সফোর্ড ডিকশনারীর মতে বিশ শতকের প্রথমার্ধে কালচার শব্দের মানে ছিল, Refinement (as) the result of cultivation, a type of civilization (chambers) improvement (by mental or physical training), intellectual development. পাশ্চাত্যে Culture শব্দটি ভূমিচাষ ও মানবভূমিচাষ উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হত। লাতিন ভাষার শব্দ Cultura থেকে ইংরেজি Culture শব্দের উৎপত্তি। লাতিনের কোল ধাতুর বাংলা অর্থ চাষ করা, যত্ন করা। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় Culture শব্দের বাংলা অর্থ 'অনুশীলন' ব্যবহার করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর Culture শব্দের বাংলা কৃষ্টি ব্যবহার করা দেখে তিনি নিরুৎসাহিত করেছিলেন। পরবর্তীতে Culture এর বাংলা স্থায়ী শব্দরূপে সংস্কৃতির আসন পাকাপোক্ত হয়। সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আহমদ শরীফ বলেছেন, -

> "সংস্কৃতি হল মানুষের অর্জিত আচরণ, পরিস্রত জীবনচেতনা। জীবিকা-সম্পৃক্ত ও পরিবেষ্টনী-প্রসূত হলেও প্রজ্ঞা ও বোধি-সম্পন্ন ব্যক্তি-চিত্তেই এর উদ্ভব এবং বিকাশ-ব্যক্তি থেকে ক্রমে সমাজে এবং সমাজ থেকে বিশ্বে তা হয় ব্যাপ্ত। চিন্তায়, কর্মে ও আচরণে জীবনের সুন্দর, শোভন, পরিশীলিত ও পরিমার্জিত অভিব্যক্তিই সংস্কৃতি। আত্মসম্মানবোধ, সহিষ্ণুতা, যুক্তিনিষ্ঠা, উদারতা, কল্যাণবুদ্ধি ও মহত্ত্বই সংস্কৃতিবানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। অনুকৃত বা অনুশীলিত হয়ে সংস্কৃতিবানের কাছ থেকে সংস্কৃতি সমাজে, দেশে সংক্রমিত হয়, এবং তখন তা পরিচিত হয় দেশীয় বা জাতীয় সংস্কৃতি নামে।"[৬]

কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর 'সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধে নিজে কোনো সংজ্ঞা না দিলেও সংস্কৃতিকে তিনি উপস্থাপন করেছেন এভাবে, -

> "সংস্কৃতি বলতে বোঝা হয় এক বিশেষ সমন্বয়-খ্রিস্টান অখ্রিস্টান সমস্ত রকমের জ্ঞান ও উৎকর্ষ এর অন্তর্ভুক্ত হয়। এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়-অতীতের শ্রেষ্ঠ ভাব-সম্পদের সমাহার। প্রথমে এর প্রবণতা হয় ব্যক্তিতান্ত্রিকতার দিকে ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষই হয় এর প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু ইয়োরোপে সঙ্ঘবদ্ধ জীবন অনেক বেশি সক্রিয়, তাই অচিরেই এই ব্যক্তিতান্ত্রিকতার মোড় ফেলে সামাজিকতার দিকে।"[৭]

মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধটিতে 'সংস্কৃতি' কোনো সমাজতাত্ত্বিক সংজ্ঞা বা নৃ-বৈজ্ঞানিক শ্রেণি বিন্যাসের বিষয় নয়; এটি মানবিক ও নৈতিক জীবনদর্শন। এই প্রবন্ধে তিনি সংস্কৃতিকে রাষ্ট্র, সমাজ কিংবা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান দ্বারা নির্ধারিত কোনো আচরণবিধি হিসেবে কল্পনা করেননি। সংস্কৃতি তাঁর কাছে মানুষের অন্তর্গত মূল্যবোধ, অনুভূতি ও আত্মগঠনের সমন্বিত প্রক্রিয়া। এই কারণেই তাঁর সংস্কৃতি-ধারণা একদিকে যেমন মতবাদবিরোধী, অন্যদিকে তেমনই যান্ত্রিক বুদ্ধিবাদের প্রতিও সংশয়ী। এই প্রবন্ধে তিনি সংস্কৃতির মানে বলছেন, -

> "সংস্কৃতি মানে জীবনের values সম্বন্ধে ধারণা। [অনেকে বলেন হায়ার ভ্যালু, কিন্তু হায়ার ভ্যালু বলে কোনো কথা থাকা উচিত নয়। কেননা, 'ভ্যালু জিনিসটা নিজেই একটা 'হায়ার' কিছু সুতরাং হায়ার কথাটা ফাজিল, অতিরিক্ত।]"[৮]

এটা নিছক সংজ্ঞা নয়, তাঁর তাত্ত্বিক অবস্থান। তিনি সচেতনভাবেই 'হায়ার ভ্যালু' শব্দবন্ধ প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং দেখিয়েছেন, মূল্যবোধ নিজেই উচ্চতর; তাকে আবার স্তরভাগে ভাগ করা মানে মানবজীবনের অভ্যন্তরীণ ঐক্যকে ভেঙে ফেলা। এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে মোতাহের হোসেন চৌধুরী আসলে আধুনিক কালের শ্রেণিবদ্ধ নৈতিকতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। তাঁর কাছে সংস্কৃতি কোনো বাহ্যিক মানদণ্ড নয়, জীবনের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির সামগ্রিক রূপ।

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 76
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 686 - 692
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৩

মোতাহের হোসেন চৌধুরীর চিন্তাচর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল সংস্কৃতি। তিনি সংস্কৃতির সাধনাকে মনুষ্যত্বের সাধনার সমার্থক বলে মনে করতেন। ইহজাগতিকতা, সৌন্দর্য, আনন্দ ও প্রেম এই উপাদানগুলো তাঁর কাছে মানবজীবনের মৌলিক অনুষঙ্গ। তিনি ছিলেন একই সঙ্গে সৌন্দর্যপ্রেমিক ও যুক্তিবাদী; আনন্দময় জীবনের অনুরাগী হলেও আবেগের অন্ধ উচ্ছ্বাসে বিশ্বাসী ছিলেন না। রেনেসাঁস-প্রভাবিত এই দৃষ্টিভঙ্গির ফলেই যুক্তির প্রতি তাঁর ছিল গভীর আস্থা। যুক্তিবিচারই তাঁর কাছে মূল্যবোধ যাচাইয়ের মানদণ্ড। তাঁর মতে, মূল্যবোধ ও যুক্তিবিচারের মধ্যে মৌলিক কোনো বিরোধ নেই। বরং যুক্তিই মানুষকে তার মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন করে তোলে এবং আবেগের বিপর্যয় থেকে রক্ষা করে। তিনি বিশ্বাস করতেন, বুদ্ধির শান্ত ও সংযত আলোয়ই মানুষ নিজের অবস্থান ও দায়িত্ব অনুধাবন করতে পারে। আত্মকেন্দ্রিকতা ও বিচ্ছিন্নতার ভয়াবহতা যুক্তিবিচারের মাধ্যমেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে, কারণ যুক্তি মানুষকে বিশ্বমানবতার সঙ্গে যুক্ত হতে শেখায়। এই চিন্তাই তাঁর সংস্কৃতি-ভাবনাকে সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে একটি উদার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে উন্নীত করেছে।

এই প্রবন্ধে সংস্কৃতির যে অবয়ব নির্মিত হয়েছে, তার একটি কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য হল মতবাদের সঙ্গে সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব। মতবাদকে তিনি ‘ঝড়’-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন, যা জীবনের সমস্ত মুকুল ঝরিয়ে দেয়। এই উপমার ভেতরে রয়েছে রাজনৈতিক ও দার্শনিক সমালোচনা। মতবাদ মানুষের চিন্তাকে একরৈখিক করে, বহুত্বকে অস্বীকার করে এবং ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট বয়ানে বন্দী করে ফেলে। সংস্কৃতি ঠিক তার বিপরীত।

> “মতবাদ ঝড়ের মতো এসে জীবনের সমস্ত মুকুল ঝরিয়ে দেয়। সংস্কৃতি ঠিক তার উল্টো, দখিন হাওয়ার মতো জীবনের সমস্ত ফুল ফুটিয়ে তোলাই তার কাজ। তখন কত রং, কত বৈচিত্র্য, কত সৌন্দর্য।”[৯]

সংস্কৃতি দখিন হাওয়ার মতো জীবনে রং, বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্যের সঞ্চার ঘটায়। এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই মোতাহের হোসেন চৌধুরী সংস্কৃতিকে একটি মুক্তিকামী চর্চা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু মুক্তির এই চর্চা সংস্কারমুক্তির নয়। তিনি মনে করেন, সংস্কারমুক্তি সংস্কৃতির শর্ত হতে পারে, কিন্তু তা অনিবার্য নয়; অনিবার্য হল মূল্যবোধ। এই বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি একদিকে ধর্মীয় গোঁড়ামির সমালোচনা করছেন, অন্যদিকে মূল্যবোধহীন মুক্তবুদ্ধির বিপদ সম্পর্কেও সতর্ক করছেন। তাঁর মতে, -

> “সংস্কারমুক্তি ছাড়াও সংস্কৃতি হতে পারে, কিন্তু মূল্যবোধ ছাড়া সংস্কৃতি অসম্ভব। মূল্যবোধহীন সংস্কারমুক্তির চেয়ে কুসংস্কারও ভালো।”[১০]

এখানে সংস্কৃতি মানুষের নান্দনিক সংবেদনশীলতার সঙ্গে যুক্ত এক নৈতিক অবস্থান - দযেখানে সৌন্দর্য, মূল্যবোধ ও মানবিকতা একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এই অবস্থান থেকে স্পষ্ট হয়, তাঁর সংস্কৃতি-চিন্তা neither orthodox nor anarchic; এটি একটি মানবতাবাদী পন্থা। তিনি এই পন্থার একটি কাব্যিক সংজ্ঞা দিয়েছেন যা এই প্রবন্ধের কেন্দ্রবিন্দু।

> “সংক্ষেপে সুন্দর করে, কবিতার মতো করে বলতে গেলে সংস্কৃতি মানে সুন্দরভাবে, বিচিত্রভাবে, মহভাবে বাঁচা; প্রকৃতি-সংসার ও মানব-সংসারের মধ্যে অসংখ্য অনুভূতির শিকড় চালিয়ে দিয়ে বিচিত্র রস টেনে নিয়ে বাঁচা; কাব্যপাঠের মারফতে, ফুলের ফোঁটায়, নদীর ধাওয়ায়, চাঁদের চাওয়ায় বাঁচা; আকাশের নীলিমায়, তৃণগুল্মের শ্যামলিমায় বাঁচা, বিরহীর নয়নজলে, মহতের জীবনদানে বাঁচা; গল্পকাহিনীর মারফতে, নরনারীর বিচিত্র সুখ-দুঃখে বাঁচা; ভ্রমণকাহিনীর মারফতে, বিচিত্র দেশ ও বিচিত্র জাতির অন্তরঙ্গ সঙ্গী হয়ে বাঁচা; ইতিহাসের মারফতে মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশে বাঁচা; জীবনকাহিনীর মারফতে দুঃখীজনের দুঃখ নিবারণের অঙ্গীকারে বাঁচা। বাঁচা, বাঁচা, বঁচা। প্রচুরভাবে, গভীরভাবে বাঁচা। বিশ্বের বুকে বুক মিলিয়ে বাঁচা।”[১১]

তাঁর সংজ্ঞা থেকে প্রতীয়মান হয়, সংস্কৃতি মানে জীবনকে গভীরভাবে অনুভব করার ক্ষমতা। প্রকৃতি, ইতিহাস, গল্প, প্রেম, বিরহ, ত্যাগ সবকিছুর সঙ্গে সংবেদনশীল সম্পর্ক স্থাপন করাই সংস্কৃতির কাজ। এই বহুমাত্রিক অনুভব মানুষকে একক

পরিচয়ের গণ্ডি থেকে মুক্ত করে। ফলে সংস্কৃতিবান মানুষ কখনোই সংকীর্ণ হতে পারে না। এই ধারণা শিখা গোষ্ঠীর বুদ্ধিবাদী চেতনার সঙ্গে যুক্ত, যেখানে জ্ঞান ও বুদ্ধির সম্প্রসারণই মুক্তির পূর্বশর্ত।

**8**

সংস্কৃতির প্রভাবে মানুষের যে বৈশিষ্ট্যগুলো গড়ে ওঠে, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল প্রেম। মোতাহের হোসেন চৌধুরীর কাছে সংস্কৃতিসাধনা মানে 'ripe' হওয়ার সাধনা। এই পরিপক্কতার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে জীবনের প্রতি, মানুষের প্রতি, সৌন্দর্যের প্রতি প্রেম। এখানে প্রেম কোনো আবেগময় দুর্বলতা নয়; নৈতিক শক্তি। যা মানুষকে অন্যের সুখ-দুঃখে অংশ নিতে শেখায়। যে মানুষ প্রেমের তাগিদে বিচিত্র জীবনধারায় স্নাত হয়নি, সে তাঁর ভাষায় অসংস্কৃত। এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তিনি মানবিক সংবেদনশীলতাকে সংস্কৃতির মূল মানদণ্ড হিসেবে স্থাপন করেছেন। মোতাহের হোসেন চৌধুরীর কাছে প্রেমই সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তি। এই প্রেম থেকেই জন্ম নেয় অন্যায় ও নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে গভীর বিরাগ। লক্ষণীয় যে, তিনি শুধু অন্যায় নিষ্ঠুরতাই নয়, 'ন্যায় নিষ্ঠুরতা'-কেও প্রত্যাখ্যান করেছেন। এই অবস্থান তাঁকে একধরনের এস্থেটিক হিউমেনিজমের দিকে নিয়ে যায়, যেখানে ন্যায় তখনই গ্রহণযোগ্য, যখন তা সৌন্দর্য ও মানবিকতার সঙ্গে যুক্ত। সংস্কৃতিবান মানুষ বাইরের আদেশে নয়, ভেতরের সূক্ষ্মচেতনায় পরিচালিত হয়। এই সূক্ষ্মচেতনা নিজের ভেতরে গড়ে তোলার জন্য সাহিত্য, শিল্প ও সংগীত নান্দনিক উপায়।

এই প্রবন্ধে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ধারণা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। সংস্কৃতিবান মানুষ স্বতন্ত্র, কারণ সে নিজের পথ নিজেই তৈরি করে নেয়। সে সমাজের কল্যাণ কামনা করে, কিন্তু সমাজের দোহাই দিয়ে নিজের অসৌন্দর্যকে ক্ষমা করে না। এই জায়গায় মোতাহের হোসেন চৌধুরী অত্যধিক সমাজচেতনার সমালোচনা করেছেন এবং দেখিয়েছেন, কেবল সমাজের দিকে তাকিয়ে মানুষ নিজের অন্তর্গত সম্ভাবনাকে বিকশিত করতে পারে না। অত্যধিক সমাজচেতনা মানুষকে একপেশে ও প্রমাণ-সাইজ করে রাখে - মানুষের চূড়ান্ত বিকাশে অন্তরায় সৃষ্টি করে। এই বক্তব্যে স্পষ্ট হয় মানবিক মুক্তি বাহ্যিক নয়, আত্মসত্তার নান্দনিক বিকাশের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর মতে, -

> "সংস্কৃতিবান মানুষ ব্যক্তিতান্ত্রিক এই অর্থে যে, সমাজ বা অর্থনীতির কথা ভেবে সে নিজের অসৌন্দর্যকে ক্ষমা করে না। এই সমাজে, এই অর্থনীতির অধীনে এরচেয়ে বেশি সুন্দর হওয়া যায় না, এ-কথা বলে নিজেকে কি অপরকে সান্ত্বনা দিতে সে লজ্জাবোধ করে। সে চায় নিজের সৌন্দর্যবোধের সম্পূর্ণ উন্মোচন, নিজের প্রতিভার সম্পূর্ণ বিকাশ। নিজের কাছ থেকে ষোলো আনা আদায় করে না নিতে পারলে সে খুশি হয় না। এই জন্য শুধু সমাজের দিকে তাকিয়ে নিজেকে প্রকাশ করা তার মনঃপূত নয়। কেননা তাতে জীবনের গভীরতর স্তরের ধ্যানকল্পনার সম্পূর্ণ প্রকাশ ব্যাহত হয়, এবং নিভৃতবাসী অন্তরপুরুষের সাক্ষাৎকার সম্ভব হয় না। জীবনের শ্রেষ্ঠ ও বহুভঙ্গিম প্রকাশ নিজের দিকে তাকিয়েই হয়, সমাজের দিকে তাকিয়ে নয়। অত্যধিক সমাজচেতনা মানুষকে একপেশে ও প্রমাণ-সাইজ করে রাখে– মানুষের চূড়ান্ত বৃদ্ধিতে অন্তরায় ঘটায়।"[12]

এই প্রবন্ধে ইন্দ্রিয়চর্চার যে আলোচনা তিনি করেছেন, তা তাঁর সংস্কৃতি-ভাবনার দার্শনিক গভীরতাকে আরও স্পষ্ট করেছে। চোখ ও কানকে তিনি 'আত্মার জিহ্বা' বলেছেন। এই রূপকটির মাধ্যমে মানুষ সৌন্দর্য ও সত্য যে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই গ্রহণ করে সে বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। ইন্দ্রিয় এখানে কেবল অনুভবের মাধ্যম নয়; মানবিক চেতনা গঠনের প্রাথমিক ক্ষেত্র। শিল্প, সংগীত ও সাহিত্য তাই সংস্কৃতির বাহ্যিক অলংকার নয়; এগুলো মানবিক মূল্যবোধ গঠনের মৌলিক উপাদান। সূক্ষ্ম অনুভূতি সংস্কৃতির দান, এবং এই সূক্ষ্ম অনুভূতিই মানুষের মূল্য সম্পর্কে সচেতন করে। মোতাহের হোসেন চৌধুরীর সংস্কৃতি-ভাবনা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, সৌন্দর্যবোধ ও ইন্দ্রিয়চর্চা একত্রে একটি আদর্শ মানব কাঠামো নির্মাণ করেছে। যেখানে মানুষ নিজের ভেতরের মানবিক সম্ভাবনার সম্পূর্ণ প্রকাশের মধ্য দিয়েই সমাজে অবস্থান করে।

'সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধে মোতাহের হোসেন চৌধুরী যে সংস্কৃতি-ধারণা নির্মাণ করেছেন, তা মূলত বুদ্ধির মুক্তির একটি দার্শনিক অবস্থান। যেখানে শিখা গোষ্ঠীর সেই ঐতিহাসিক উচ্চারণ "জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট,

*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 76
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 686 - 692
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মুক্তি সেখানে অসম্ভব" এর একটি নান্দনিক ও মানবিক ব্যাখ্যা। এখানে জ্ঞান কেবল তথ্য বা শাস্ত্রীয় অনুশীলনে সীমাবদ্ধ নয়; বুদ্ধি মানে অনুভব, বিচারবোধ ও সৌন্দর্যবোধের সমন্বিত বিকাশ। এই বুদ্ধিই মুক্তির প্রকৃত শর্ত, কারণ তা মানুষকে যান্ত্রিক যুক্তি ও মতবাদী সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে মানবিক পরিপক্বতার দিকে নিয়ে যায়। বিশেষত বাঙালি মুসলমান সমাজের প্রেক্ষাপটে, যেখানে ধর্ম ও সমাজ বহুদিন ধরে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে সংকুচিত করেছে, সেখানে তাঁর সংস্কৃতি-ভাবনা মুক্তির একটি বিকল্প পথ। সংস্কৃতি এখানে কোনো বিলাসিতা নয়; এটি মানুষের মানুষ হয়ে ওঠার শর্ত। মোতাহের হোসেন চৌধুরীর কাছে সংস্কৃতি মানুষের আত্মগঠনের অপরিহার্য অনুশীলন। এই অর্থে, মোতাহের হোসেন চৌধুরীর সংস্কৃতি একাধারে জীবনদর্শন ও নৈতিক অবস্থান। যা মোতাহের হোসেন চৌধুরীর প্রবাদ-প্রতীম বাক্যকে বাস্তবিক রূপদান করেছে।

> "ধর্ম সাধারণ লোকের কালচার, আর কালচার শিক্ষিত, মার্জিত লোকের ধর্ম।"[১৩]

এই বাক্যের মধ্য দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন, সংস্কৃতি কোনো ধর্মবিরোধী অবস্থান নয়; সংস্কৃতি হল সৌন্দর্য, মূল্যবোধ ও বুদ্ধির মিলিত বিকাশ, যা মানুষের মুক্তিকে সম্ভব করে তোলে।

মোতাহের হোসেন চৌধুরীর সংস্কৃতি কথা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাঁর কাছে সংস্কৃতি কোনো বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস কিংবা সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য নয়। সংস্কৃতি মূলত মানুষের চিন্তা, রুচি, বিচারবোধ ও জীবনদৃষ্টির পরিশীলনের প্রক্রিয়া। এই অর্থে সংস্কৃতির প্রথম কাজ মানুষকে মুক্তবুদ্ধির অধিকারী করে তোলা। মুক্তবুদ্ধি মানুষকে অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে প্রশ্ন করতে এবং বিচার করতে শেখায়। এর সঙ্গে যুক্ত হয় রুচির পরিশীলন। শুধু শিক্ষিত হওয়া নয়, সুন্দর-মহৎ-মানবিককে উপলব্ধি করার ক্ষমতা অর্জনই সংস্কৃতির লক্ষণ। ফলে সংস্কৃতি মানুষের বাহ্যিক উন্নতির চেয়ে তার অন্তর্জগতের বিকাশকে অধিক গুরুত্ব দেয়। অর্থ, শিক্ষা, পেশাগত সাফল্য কিংবা সামাজিক মর্যাদা মানুষকে উন্নত অবস্থানে নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু তাকে প্রকৃত অর্থে সংস্কৃতিবান করে তোলে তার চিন্তা, রুচি ও মানসিকতার পরিশীলন। এই পরিশীলন থেকেই শুরু হয় আত্মবিকাশ; মানুষ নিজের সীমাবদ্ধতা, সংকীর্ণতা ও অজ্ঞতাকে অতিক্রম করে ক্রমাগত নিজেকে উন্নত করতে শেখে। আত্মবিকাশের এই প্রক্রিয়া শেষপর্যন্ত মানুষকে মানবিকতার দিকে নিয়ে যায়। অন্যের স্বাধীনতা, মর্যাদা ও অস্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলে। তাই সংস্কৃতি কোনো নির্দিষ্ট ধর্ম, সম্প্রদায় বা জাতির একচেটিয়া সম্পত্তি নয়; এর চূড়ান্ত মূল্য নিহিত মানুষের মানবিক হয়ে ওঠায়। এ কারণেই মোতাহের হোসেন চৌধুরীর কাছে সংস্কৃতি কোনো অলংকার বা সামাজিক মর্যাদার উপকরণ নয়, জীবনকে অধিকতর সুন্দর, মুক্ত, মহৎ ও অর্থবহ করে তোলার এক উচ্চতর সাধনা। তাঁর সংস্কৃতিচিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে একটি ধারাবাহিক উত্তরণ লক্ষ করা যায় - সংস্কৃতি থেকে মুক্তবুদ্ধি, মুক্তবুদ্ধি থেকে রুচির পরিশীলন, রুচি থেকে আত্মবিকাশ, আত্মবিকাশ থেকে মানবিকতা এবং মানবিকতার মধ্য দিয়ে প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠা।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, মোতাহের হোসেন চৌধুরী একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ডিসকোর্স নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। এই ডিসকোর্সের কেন্দ্রে রয়েছে 'সংস্কৃতিবান মানুষ'-এর ধারণা। মানুষ যখন সৌন্দর্য, আনন্দ, প্রেম ও বুদ্ধিবৃত্তিক সততার সঙ্গে নিজের জীবনকে নির্মাণ করে, তখনই সে প্রকৃত অর্থে সংস্কৃতিবান হয়ে ওঠে। এই চিন্তা রবীন্দ্রোত্তর বাংলায় মানবজীবনের সৌন্দর্যকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা একটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ধারা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

## Reference:

১. হুসেন, আবুল, 'বার্ষিক বিবরণী', *শিখা সমগ্র* (সম্পাদনা: মুস্তাফা নূরউল ইসলাম), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯২৭, পৃ.২৮
২. রহমান, লুতফর, 'জাতির উত্থান', *লুতফর রহমান রচনাবলী প্রথম খণ্ড*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭২, পৃ. ৬

OPEN ACCESS
IF 8.111
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 76*
*Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 686 - 692*
*Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive*

৩. রহমান, হাবিব, ‘মুসলিম সাহিত্য সমাজ: জন্মেতিহাস ও চিন্তা দর্শন’, *মুসলিম সাহিত্য সমাজ-এর বার্ষিক অধিবেশন সভাপতিদের অভিভাষণ,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ২২

৪. ছফা, আহমদ, ‘সংস্কৃতির জীয়নকাঠি’, *নির্বাচিত প্রবন্ধ,* মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ১০৪

৫. চৌধুরী, কাজী মোতাহার হোসেন, ‘সংস্কৃতি ও সভ্যতা’, *কাজী মোতাহার হোসেন চৌধুরী রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ৩০

৬. শরীফ, আহমদ, ‘বাঙলার সংস্কৃতি প্রসঙ্গে’, *নির্বাচিত প্রবন্ধ,* আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ১৭৯

৭. ওদুদ, কাজী আবদুল, *নির্বাচিত প্রবন্ধ (শাশ্বত বঙ্গ),* দি স্কাই পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৩৩

৮. চৌধুরী, মোতাহের হোসেন, *সংস্কৃতি কথা,* বুকস ফেয়ার, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৩৪

৯. তদেব, পৃ. ৩৬

১০. তদেব, পৃ. ৩৭

১১. তদেব, পৃ. ৩৭

১২. তদেব, পৃ. ২৬

১৩. তদেব, পৃ. ২৫